أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 96) www.motaher21.net

ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً

"ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ করো"

" Enter into Islam whole heartedly."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২০৮

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۪ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না, কেননা সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।

২০৮ নং আয়াতের তাফসীর:

পুরোপুরি ইসলামে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে

মহান আল্লাহ্ তাঁর ওপরে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণকে ও তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সত্যতা স্বীকারকারীগণকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তাঁর সমস্ত নির্দেশ মেনে চলে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকে ও পূর্ণ শারী‘আতের ওপর ‘আমল করে। আল ‘আউফী (রহঃ) বলেন, ইবনু

‘আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাঊস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইকরামাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইবনু যায়দ (রহঃ) বলেছেন যে, سِلْمٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইসলাম। (তাফসীর তাবারী ৪/২৫২, তাফসীর ইবনু আবী হাতিম২/৫৮৪-৫৮৫) ভাবার্থ আনুগত্য ও সততাও হতে পারে। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), আবুল ‘আলিয়া (রহঃ), ইকরামাহ (রহঃ), রাবী‘ ইবনু আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইবনু হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) তাদের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, كافة শব্দের অর্থ হচ্ছে, ‘সবকিছু’ ও ‘পরিপূর্ণ’। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ২/৫৮৬-৫৮৮) বিভিন্ন মহান ব্যক্তি যারা ইয়াহূদী হতে মুসলিম হয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট তারা আবেদন জানিয়েছিলেন যে, তাদেরকে যেন শনিবার উৎসবের দিন হিসেবে পালন করার ও রাতে তাওরাতের ওপর ‘আমল করার অনুমতি দেয়া হয়। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাদেরকে বলা হয়, ইসলামের নির্দেশাবলীর ওপরেই ‘আমল করতে হবে। কিন্তু এখানে ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) নাম ঠিক বলে মনে হয় না। কেননা, তিনি উচ্চ স্তরের পণ্ডিত ছিলেন এবং পূর্ণ মুসলমান ছিলেন। তিনি পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন যে, শনিবারের মর্যাদা রহিত হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে শুক্রবার ইসলামের উৎসবের দিন হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং এটা অসম্ভব কথা যে, এরূপ অভিলাসের ওপর তিনি অন্যদের সাথে হাত মিলাবেন।

কোন কোন তাফসীরকারক كافة শব্দটিকে حال বলেছেন। অর্থাৎ তোমরা সবাই ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। কিন্তু প্রথম উক্তিটি অধিকতর সঠিক। অর্থাৎ তোমরা সাধ্যানুসারে ইসলামের প্রত্যেক নির্দেশ মেনে চলো। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আহলে কিতাব ইসলাম গ্রহণের পরেও তাওরাতের কতোগুলো নির্দেশ মেনে চলতো। তাদেরকেই বলা হচ্ছে ‘দ্বীনে মুহাম্মাদী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর’ মধ্যে পুরোপুরি এসে যাও। এর কোন ‘আমলই পরিত্যাগ করো না। তাওরাতের ওপর শুধু ঈমান রাখাই যথেষ্ট।

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ ﴿وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ١ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾

‘আর শায়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ মহান

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেনঃ

﴿اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

‘সে তো শুধুমাত্র তোমাদেরকে আদেশ করে শায়তানী ও অশ্লীল কাজ করতে এবং মহান আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা যা জানো না তা বলতে।’ (২নং সূরাহ্ বাকারাহ, আয়াতা নং ১৬৯) এবং

﴿اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ﴾

‘সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়।’ (৩৫নং সূরাহ্ ফাতির, আয়াত নং ৬) আর এ জন্যই বলা হয়েছে যে, اِنَّهٗلَكُمْعَدُوٌّمُّبِيْنٌ ‘সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ এরপরে বলা হচ্ছেঃ

﴿فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاجَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

‘প্রমাণ জেনে নেয়ার পরেও যদি তোমরা সত্য হতে সরে পড়ো তাহলে জেনে রেখো যে, মহান আল্লাহ্ প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত।’ না তাঁর থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে, আর না তাঁর ওপর কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তিনি তাঁর নির্দেশাবলী চালু করার ব্যাপারে মহা বিজ্ঞানময়। পাকড়াও করার কাজে তিনি মহান পরাক্রশালী এবং নির্দেশ জারী করার কাজে তিনি মহা বিজ্ঞানময়। তিনি কাফিরদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারকারী এবং তাদের ওযর ও প্রমাণ কর্তন করার ব্যাপারে তিনি নৈপুণ্যের অধিকারী।

অর্থাৎ কোন প্রকার ব্যতিক্রম ও সংরক্ষন ছাড়াই, কিছু অংশকে বাদ না দিয়ে এবং কিছু অংশকে সংরক্ষিত না রেখে জীবনের সমগ্র পরিসরটাই ইসলামের আওতাধীন করো। তোমাদের চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ, মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, আচরণ, ব্যবহারিক জীবন, লেনদেন এবং তোমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিসরকে পুরোপুরি ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে আনো। তোমাদের জীবনের কিছু অংশে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলবে আর কিছু অংশকে ইসলামী অনুশাসনের বাইরে রাখবে, এমনটি যেন না হয়।

ঈমানদারদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করে যাও। এমন করো না যে, যে নির্দেশগুলো তোমাদের স্বার্থ ও মনপসন্দ হবে, সেগুলোর উপর আমল করবে এবং অন্যান্য নির্দেশগুলো ত্যাগ করবে। অনুরূপ যে দ্বীন তোমরা ছেড়ে এসেছ, তার কথাও ইসলামে প্রবেশ করানোর অপচেষ্টা করো না; বরং কেবল ইসলামকেই পূর্ণরূপে বরণ করে নাও। এ আয়াতে দ্বীনের নামে বিদআতেরও খন্ডন করা হয়েছে এবং বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীদের মতবাদও খন্ডন করা হয়েছে, যারা ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, বরং দ্বীনকে কেবল (ব্যক্তিগত) ইবাদত অর্থাৎ, মসজিদে সীমাবদ্ধ রেখে রাজনীতি এবং দেশের সংসদ থেকে তাকে নির্বাসন দিতে চায়। এইভাবে জনসাধারণকেও বুঝানো হচ্ছে, যারা প্রচলিত প্রথা ও লোকাচার এবং আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পছন্দ করে, কোন মতেই তারা এগুলোকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়; যেমন মৃত্যু ও বিবাহ-শাদীতে ব্যয়বহুল ও অপচয়মূলক এবং বিজাতীয় রীতিনীতি ইত্যাদির অনুকরণ করে থাকে, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা সেই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, যে ইসলাম পরিপন্থী কথা ও কর্মকে লোভনীয় ও শোভনীয় ভঙ্গীতে তোমাদের সামনে পেশ করে, যে মন্দের উপর খুব ভালোর

লেবেল চড়ায় এবং বিদআতকেও নেকীর কাজ বলে বুঝায়, যাতে সর্বদা তোমরা তার পাতা জালে ফেঁসে থাকো।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সকল মু'মিনকে ইসলামে পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন- সর্বক্ষেত্রে যাবতীয় বিধান যথাসম্ভব পালন ও সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার মাধ্যমে।

এ আয়াতে দীনের নামে বিদআত তৈরি করার বিষয়টি যেমন খণ্ডন করা হয়েছে তেমনি ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীদের মতবাদও খণ্ডন করা হয়েছে।

যারা ইসলামকে সর্বত্র গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ধর্মকে কেবল ব্যক্তিগত আমল বা মাসজিদ কেন্দ্রীক ইবাদতে সীমাবদ্ধ করতে চায়, সকল ময়দান থেকে ইসলামকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুসরণ করে রাজনীতি, অর্থনীতি, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসদকে ইসলাম মুক্ত করতে চায় এবং সাধারণ জনগণকেও এরূপ বুঝাতে চেষ্টা করে তাদেরকে শয়তানের পথ অনুসরণ করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করছেন। তাদেরকে অবশ্যই জেনে রাখা দরকার ইসলাম শুধু মাসজিদেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম প্রযোজ্য এবং একজন মুসলিমের জীবনের একমাত্র সংবিধান।

অতএব হে ঈমানদারগণ শয়তান চায় ইসলাম বিরোধী কর্ম ও পন্থাকে লোভনীয় ও শোভনীয় করে তোমাদের কাছে তুলে ধরে ঈমানকে হরণ করে নিতে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّنْکَ اِنِّیْٓ اَخَافُ اللّٰہَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ)

"তাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মত- যে মানুষকে বলে: কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।" (সূরা হাশর ৫৯:১৬)

এসব উপদেশমালা ও সুস্পষ্ট বিধানাবলী আসার পরেও যদি আল্লাহ তা'আলা দীন ত্যাগ কর, তাহলে জেনে রেখ আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

শয়তানের অনুসারীরা অপেক্ষা করে যে, আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ার সাথে তাদের কাছে এসে ফায়সালা করে দেবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই সবকিছু ফায়সালা করে দিয়েছেন। সবকিছু তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।

☆ সাওম-এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা শরিয়তের পরিভাষায় পানাহার এবং স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকার নাম 'সওম'। তবে সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা রোজা বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের সামান্য আগেও যদি কেউ কিছু পান করে অথবা খেয়ে ফেলে অথবা স্ত্রীসহবাস করে তাহলে রোযা হবেনা। আবার সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি রোযার নিয়ত না থাকে তাহলেও রোযা হবেনা। এই আয়াত থেকে আমরা একমাত্র জানতে পারলাম যে রোযা আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরজ ছিল। যদিও আমরা তাদেরকে হুবহু আমাদের মত রোযা রাখতে দেখিনা তবুও ইহুদী, খ্রীষ্টান এমনকি হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যেও কোন না কোন প্রকারে উপবাস তথা রোযা রাখার বিধান দেখি। মূলত রোযার বিধানও তাদের মধ্যে অন্যান্য বিধানের মত বিকৃত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে রোযা রাখা ফরজ হওয়ার ঘোষণার সাথে সাথে এর উদ্দেশ্যও বর্ণনা করা হয়েছে-তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়ার অর্থ হল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর বিধি নিষেধগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি মূহুর্তে মেনে চলা। মূলত রোযা এই মেনে চলার ধারাবাহিক ও দীর্ঘস্থায়ী ট্রেনিং দিয়ে থাকে। অন্যান্য

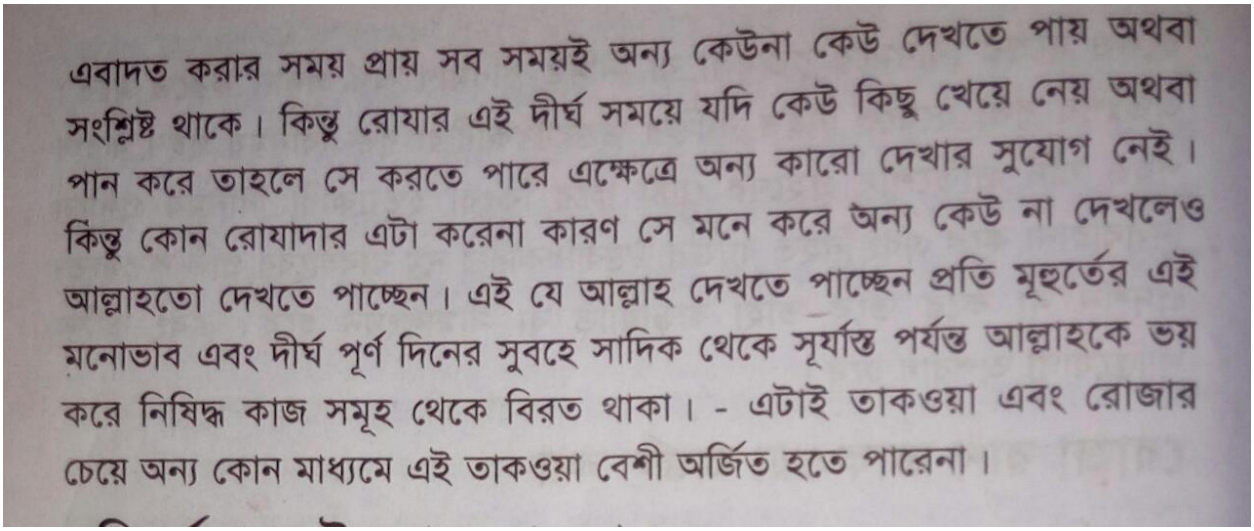
এবাদত করার সময় প্রায় সব সময়ই অন্য কেউনা কেউ দেখতে পায় অথবা সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু রোযার এই দীর্ঘ সময়ে যদি কেউ কিছু খেয়ে নেয় অথবা পান করে তাহলে সে করতে পারে এক্ষেত্রে অন্য কারো দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু কোন রোযাদার এটা করেনা কারণ সে মনে করে অন্য কেউ না দেখলেও আল্লাহতো দেখতে পাচ্ছেন। এই যে আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন প্রতি মূহুর্তের এই মনোভাব এবং দীর্ঘ পূর্ণ দিনের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহকে ভয় করে নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকা। - এটাই তাকওয়া এবং রোজার চেয়ে অন্য কোন মাধ্যমে এই তাকওয়া বেশী অর্জিত হতে পারেনা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইসলামের সকল বিধান সম্পূর্ণভাবে মাথা পেতে মেনে নেয়া মুসলিমদের আবশ্যক।

২. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্র“। তাই তাকে শত্র“ হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত।

৩. আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামাতের দিন ফায়সালা করার জন্য আসবেন।

৪. তাওবার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা উচিত নয়।

৫. আল্লাহ তা‘আলা ওপরে আছেন, স্ব-স্বত্বায় সবত্র বিরাজমান নয়। সর্বত্র বিরাজমান থাকলে কিয়ামতের দিন ফায়সালা করার জন্য আসার কোন অর্থ হয়না। আল্লাহ তা‘আলা স্ব-স্বত্বায় সর্বত্র বিরাজমান, এটা বাতিল সম্প্রদায়ের আক্বীদাহ।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৮৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেয়া হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। এ থেকে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যাবে।

১৮৩ নং আয়াতের তাফসীর:

সিয়াম পালন করার আদেশ

মহান আল্লাহ এই উম্মাতের ঈমানদারগণকে সম্বোধন করে বলেন যে, তারা যেন সিয়াম পালন করে। সিয়ামের অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে খাঁটি নিয়াতে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকা। এর উপকারিতা এই যে, এর ফলে মানবাত্মা পাপ ও কালিমা থেকে সম্পূর্ণ রূপে পরিস্কার ও পবিত্র হয়ে যায়। এর সাথে সাথেই মহান আল্লাহ বলেন যে, এই সিয়ামের হুকুম শুধুমাত্র তাদের ওপরেই হচ্ছে না, বরং তাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের প্রতিও সিয়ামের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এই বর্ণনার উদ্দেশ্য এটাও যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী যেন এই কর্তব্য পালনে পূর্বের উম্মাতদের পিছে না পড়ে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا١ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ﴾

‘তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমি নির্দিষ্ট শারী‘আত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম; আর যদি মহান আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, যে ধর্ম তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও।’ (৫ নং সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং ৪৮)

এই বর্ণনাই এখানেও করা হচ্ছে যে, ‘এই সিয়াম তোমাদের ওপর ঐ রকমই ফরয, যেমন ফরয ছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। সিয়াম পালনের দ্বারা শরীরের পবিত্রতা লাভ হয় এবং শায়তানের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

‘হে যুবকবৃন্দ! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য রয়েছে সে বিয়ে করবে, আর যার সামর্থ্য নেই সে সিয়াম পালন করবে। এটা তার জন্য রক্ষা কবয হবে।’ (সহীহুল বুখারী ৪/১৪২/১৯০৫, ফাতহুল বারী ৯/৮, সহীহ মুসলিম ২/১-৩/১০১৮, ১০১৯)

অতঃপর সিয়ামের জন্য দিনের সংখ্যা বর্ণনা করা হচ্ছে যে ‘এটি কয়েকটি দিন মাত্র’ যাতে কারো ওপর বোঝা স্বরূপ না হয় এবং কেউ আদায়ে অসমর্থ হয়ে না পড়ে; বরং আগ্রহের সাথে তা পালন করে।

বিভিন্ন প্রকার সিয়ামের বর্ণনা

প্রথমে প্রতি মাসে তিনটি সাওম রাখার নির্দেশ ছিলো। অতঃপর রামাযানের সাওমের নির্দেশ হয় এবং পূর্বের নির্দেশ উঠে যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশা'আল্লাহ সামনে আসছে। মু'আয (রাঃ), ইবনু মাস'উদ (রাঃ) ইবনে 'আব্বাস (রাঃ), 'আতা (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ)-এর অভিমত এই যে নূহ (আঃ) এর যুগে প্রতি মাসে তিনটি সাওমের নির্দেশ ছিলো, যা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মাতের জন্য পরিবর্তিত হয় এবং তাদের ওপর এই বরকতময় মাসে সাওম ফরয করা হয়।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, পূর্ববর্তী উম্মাতদের ওপরও পূর্ণ একমাস সাওম ফরয ছিলো। একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

صِيَامُ رَمَضَانَ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ

রামাযানের সাওম তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের ওপর ফরয ছিলো।' (ইবনে হাজার ফাতহুল বারী-৮/২৭ উল্লেখ করে বলেছেন অত্র হাদীসের সনদটি অপরিচিত। অতএব হাদীস য'ঈফ) সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, পূর্বে 'আশুরার সিয়াম পালন করা হতো। যখন রামাযানের সিয়াম ফরয করা হয় তখন আর 'আশুরার সিয়াম বাধ্যতামূলক থাকে না; বরং যিনি ইচ্ছা করতেন পালন করতেন এবং যিনি চাইতেন না, পালন করতেন না। (সহীহুল বুখারী ৪/২৮৭/২০০২, ৮/২৬/৪৫০১, ৪৫০৩, ফাতহুল বারী ৮/২৬, সহীহ মুসলিম ২/১১৩/৭৯২)

পূর্ববর্তী উম্মাতের সাওম পালনের পদ্ধতি

ইবনে 'উমার (রাঃ) বলেনঃ পূর্ববর্তী উম্মাতের প্রতি এই নির্দেশ ছিলো যে, 'ঈশার সালাত আদায় করার পর যখন তারা শুয়ে যেতো তখনই তাদের ওপর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেতো। 'পূর্ববর্তী' হতে ভাবার্থ হচ্ছে আহলে কিতাব।

এরপর বলা হচ্ছে রমযান মাসে যে ব্যক্তি রুগ্ন হয়ে পড়ে ঐ অবস্থায় তাকে কষ্ট করে সাওম পালন করতে হবে না। পরে যখন সে সুস্থ হবে তখন তা আদায় করে নিবে। তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে ব্যক্তি সুস্থ থাকতো এবং মুসাফিরও হতো না তার জন্যও এই অনুমতি ছিলো যে, হয় সে সাওম রাখবে বা সাওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে ভোজ্য দান করবে এবং একজনের বেশি মিসকীনকে খাওয়ানো উত্তম ছিলো। কিন্তু মিসকীনকে ভোজ্য দান অপেক্ষা সাওম রাখাই বেশি মঙ্গলজনক কাজ ছিলো। ইবনে মাস'উদ (রাঃ), ইবনে 'আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) ত্বা'উস (রহঃ), মুকাতিল (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ এটাই বলে থাকেন।

সালাত ও সাওম তিনটি অবস্থায় পরিবর্তিত হয়

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেনঃ সালাত ও সাওম পর্যায়ক্রমে তিনটি অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। সালাতের তিনটি অবস্থা হচ্ছেঃ (১) মদীনায় এসে ষোল সতেরো মাস ধরে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা, অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে মাক্কার দিকে মুখ করা হয়। (২) পূর্বে সালাতের জন্য একে অপর কে ডাকতেন এবং একত্রিত হতেন, অবশেষে এতে তাঁরা অসমর্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে 'আবদি রব্বিহী (রাঃ) নামক একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেনঃ হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্ন দেখার মতোই আমি স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু যদি বলি যে, আমি নিদ্রিত ছিলাম না তবে আমার সত্য কথাই বলা হবে। স্বপ্নটি এই যে, সবুজ রঙের হিল্লা বা লুঙ্গি ও চাদর পরিহিত এক ব্যক্তি কিবলার দিকে মুখ করে বলছেনঃ

اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر-- দু'বার। এভাবে তিনি আযান শেষ করেন। কিছুক্ষণের বিরতির পর তিনি পূর্বের কথাগুলো আবার উচ্চারণ করেন। কিন্তু এবারে

قد قامت الصلوة কথাটি দু'বার অতিরিক্ত বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন বিলাল (রাঃ) কে এটা শিখিয়ে দাও। সে আযান দিবে। সুতরাং সর্বপ্রথম বিলাল (রাঃ) আযান দেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, 'উমার (রাঃ) ও এসে এই স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পূর্বেই যায়দ (রাঃ) এসে গিয়েছিলেন।

(৩) পূর্বে প্রচলন ছিলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত পড়াচ্ছেন, তাঁর কয়েক রাক'আত পড়া হয়ে গেছে এমন সময় কেউ আসছেন। কয় রাক'আত পড়া হয়েছে এটা তিনি ইঙ্গিতে কাউকে জিজ্ঞেস করছেন। তিনি বলেছেন, এক রাক'আত বা দু' রাক'আত। তিনি তখন ঐ রাক'আত গুলো পড়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মিলিত হচ্ছেন। একবার মু'আয (রাঃ) আসছেন এবং বলছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যে অবস্থাতেই পাবো সেই অবস্থাতেই তাঁর সাথে মিলিত হয়ে যাবো। আর যে সালাত ছুটে গেছে তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সালাম ফিরাবার পর পড়ে নিবো। সুতরাং তিনি তাই করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাম ফিরানোর পর তাঁর ছুটে যাওয়া রাক'আত গুলো আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে যান। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ إِنَّهُ قَد سَنَّ لَكُمْ مُعَاذ، فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا

মু'আয (রাঃ) তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা বের করেছেন। তোমরাও এখন হতে এরূপই করবে। এই তো হলো সালাতের তিনটি পরিবর্তন।

সাওম এর পর্যায়ক্রমে তিনটি পরিবর্তন

(১) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি প্রতি মাসে তিনটি সাওম রাখতেন এবং ‘আশূরার সাওম রাখতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ অবতীর্ণ করে রামাযানের সাওম ফরয করেন।

(২) প্রথমতঃ এই নিদেশ ছিলো যে চাইবে সাওম রাখবে এবং যে চাইবে সাওমর পরিবর্তে মিসকীনকে ভোজ্য দান করবো। অতঃপর ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি ঐ মাসে নিজ আবাসে উপস্থিত থাকে সে যেন তাতে সাওম পালন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি বাড়িতে অবস্থানকারী হয় এবং মুসাফির না হয়, সুস্থ হয় রুগ্ন না হয়,তার ওপর সাওম বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তবে রুগ্ন ও মুসাফিরের জন্য অবকাশ থাকে। আর এমন বৃদ্ধের জন্যও অবকাশ থাকে যে সাওম রাখার ক্ষমতাই রাখে না সে ফিদইয়াহ দেয়ার অনুমতি লাভ করে।

(৩) পূর্বে রাতে নিদ্রা যাওয়ার আগে আগে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ ছিলো বটে, কিন্তু ঘুমিয়ে যাবার পর রাত্রির মধ্যেই জেগে উঠলেও পানাহার ও সহবাস তাঁর জন্য নিষিদ্ধ ছিলো। অতঃপর একবার সুরমাহ নামক একজন আনসারী (রাঃ) সারাদিন কাজ কর্ম করে ক্লান্ত অবস্থায় রাতে বাড়ি ফিরে আসেন এবং ‘ঈশার সালাত আদায় করেই তাঁর ঘুম চলে আসে ফলে তিনি ঘুমিয়ে যান। পরদিন কিছু পানাহার ছাড়াই তিনি সাওম রাখেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ ব্যাপার কি? তখন তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। এদিকে তাঁর ব্যাপারে তো এই ঘটনা ঘটে আর ওদিকে ‘উমার (রাঃ) ঘুমিয়ে যাওয়ার পর জেগে উঠে স্ত্রী সহবাস করে বসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করে অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথে এই দোষ স্বীকার করেন। ফলেঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

আয়াতাংশ বিশেষ অবতীর্ণ হয় এবং মাগরিব থেকে নিয়ে সুবহে সাদিক পর্যন্ত রামাযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের অনুমতি দেয়া হয়। (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদে আহমাদ ৫/২৪৬, ২৪৭, সুনান আবূ দাউদ ১/১৩৮/৫০৬, ৫০৭, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ ১/১৯৮-২০০/৩৮২-৩৮৪)

অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তির সিয়ামের পরিবর্তে ফিদইয়া প্রদান

﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ﴾এর ভাবার্থে মু‘আয (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইচ্ছা করলে কেউ সিয়াম পালন করতেন আবার কেউ করতেননা। বরং মিসকীনকে খাদ্য দান করতেন। সালামাহ ইবনে

আকওয়া (রাঃ) থেকে সহীহুল বুখারীতে একটি বর্ণনা এসেছে যে, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যে ব্যক্তি ইচ্ছা করতো সিয়াম ছেড়ে দিয়ে 'ফিদইয়া' দিয়ে দিতো। অতঃপর এর পরবর্তী আয়াত ﴿وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ﴾ অবতীর্ণ হয় এবং এটি 'মানসূখ' বা রহিত হয়ে যায়। (হাদীস সহীহ। সহীহুল বুখারী ৮/২৯/৪৫০৬, সহীহ মুসলিম ২/১৪৯/৮০২, সুনান আবূ দাউদ ২/২৯২/২৩১৫, জামি' তিরমিযী ৩/১৬২/৭৯৮, সুনান নাসাঈ ৪/৫০৩/২৩১৫, সুনান দারিমী- ২/২৭/৬৭২৪, ফাতহুল বারী ৮/২৯) 'উমার (রাঃ) ও এটিকে মানসূখ বলেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা মানসূখ নয়, বরং এর ভাবার্থ হচ্ছে বৃদ্ধ পুরুষ বা মহিলা, যারা সিয়াম পালন করার ক্ষমতা রাখে না। (সহীহুল বুখারী ৮/২৮/৪৫০৫, ফাতহুল বারী ৮/২৮)

ইবনে আবি লাইলা (রহঃ) বলেনঃ 'আমি 'আতা (রহঃ) এর নিকট রামাযান মাসে আগমন করি। আমি দেখতে পাই যে, তিনি খানা খাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি বলেনঃ 'ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি আছে যে, এই আয়াতটি পূর্বের আয়াতটিকে মানসূখ করেনি, বরং এই হুকুম শুধুমাত্র শক্তিহীন, অচল বৃদ্ধদের জন্য রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/২৮) মোট কথা এই যে, যে ব্যক্তি নিজ আবাসে আছে এবং সুস্থ ও সবল অবস্থায় রয়েছে তার জন্য এই নির্দেশ নয়। বরং তাকে সিয়ামই পালন করতে হবে। তবে হ্যাঁ, খুবই বয়স্ক, বৃদ্ধ এবং দুর্বল লোক যাদের সিয়াম পালন করার ক্ষমতা নেই, তারা সিয়াম পালন করবে না এবং তাদের ওপর সিয়াম কাযাও যরুরী নয়। কারণ তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই, ফলে ভবিষ্যতেও তারা সিয়াম পালন করতে সক্ষম হবে না। এমতাবস্থায় তাদেরকে প্রতিটি ছুটে যাওয়া সিয়ামের জন্য ফিদইয়া বা কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি সে ধনী হয় তবে তাকে কাফ্ফারাও আদায় করতে হবে কি হবে না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) এর একটি উক্তি তো এই যে, যেহেতু তাঁর সাওম রাখার শক্তি নেই সুতরাং সে নাবালক ছেলের মতোই। তার ওপর যেমন কাফ্ফারা নেই তেমনই এর ওপরও নেই। কেননা মহান আল্লাহ কাউকেও ক্ষমতার অতিরিক্ত কষ্ট দেন না।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) এর দ্বিতীয় উক্তি এই যে তাঁর দায়িত্বে কাফ্ফারা রয়েছে। এটাই ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) এবং বিভিন্ন 'আলিমের অভিমত, যাদের মধ্যে সালাফি সালিহীনগণও রয়েছেন। (তাফসীর তাবারী ৩/৪৩১) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর এটাই পছন্দনীয় অভিমত। তিনি বলেন যে, খুব বেশি বয়স্ক যারা সিয়াম পালন করার শক্তি নেই সেই 'ফিদইয়াই' দিয়ে দিবে। যেমন আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) শেষ বয়সে অত্যন্ত বার্ধক্য অবস্থায় দু'বছর ধরে সিয়াম পালন করেন নি এবং তিনি প্রতিটি সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে গোশত-রুটি আহার করাতেন। (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী- ৮/২৮,ফাতহুল বারী ৮/১৭৯, আল মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ৩/১৬৪)

'মুসনাদ আবূ ই'য়ালা' গ্রন্থে রয়েছে যে, যখন আনাস (রাঃ) সিয়াম পালন করতে অসমর্থ্য হয়ে পড়েন তখন রুটি ও গোশত তৈরী করে ত্রিশ জন মিসকীনকে আহার করান। (মুসনাদ আবূ ইয়ালা ৭/২০৪)
অনুরূপভাবে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মহিলারা যখন তাদের নিজেদের ও সন্তানদের জীবনের ভয় করবে এদের

ব্যাপারেও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, তারা সিয়াম পালন করবে না, বরং 'ফিদইয়া' দিবে এবং যখন ভয় দূর হয়ে যাবে তখন সিয়াম কাযা করে নিবে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, শুধু ফিদ্ইয়া যথেষ্ট কাযা করার প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ আবার বলেন যে, সিয়াম পালন করবে, 'ফিদইয়া' বা কাযা নয়। আমি [ইবনে কাসীর (রহঃ)] এ মাস'আলাটি 'কিতাবুস সিয়াম' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

(صوم) এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম 'সাওম'। তবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যস্ত পর্যন্ত সিয়ামের নিয়্যতে একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা সিয়াম বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে কিংবা সহবাস করে, তবে সিয়াম হবে না। অনুরূপ উপায়ে সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি সিয়ামের নিয়্যত না থাকে, তবে তাও সিয়াম পালন হবে না। সিয়াম ইসলামের মূল ভিত্তি বা আরকানের অন্যতম। সিয়ামের অপরিসীম ফযীলত রয়েছে।

মুসলিমদের প্রতি সিয়াম ফরয হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নবীর উল্লেখসহ দেয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিয়াম শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন সিয়ামের বিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে, তেমনি মুসলিমদের এ মর্মে একটি শান্তনাও দেয়া হয়েছে যে, সিয়াম একটা কষ্টকর 'ইবাদাত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয করা হয়েছিল। কেননা, সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন একটা কষ্টকর কাজে অনেক লোক একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয়। আয়াতের মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, "সিয়াম যেমন মুসলিমদের উপর ফরয করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল'; এ কথা দ্বারা এ তথ্য বুঝায় না যে, আগেকার উম্মতগণের সিয়াম সমগ্র শর্ত ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মুসলিমদের উপর ফরযকৃত সিয়ামেরই অনুরূপ ছিল। যেমন, সিয়ামের সময়সীমা, সংখ্যা এবং কখন তা রাখা হবে, এসব ব্যাপারে আগেকার উম্মতদের সিয়ামের সাথে মুসলিমদের সিয়ামের পার্থক্য হতে পারে, বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। বিভিন্ন সময়ে সিয়ামের সময়সীমা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাকওয়া শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে সিয়ামের একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা, সিয়ামের মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই 'তাকওয়া'র ভিত্তি।

ইসলামের অন্যান্য বিধানের মতো রোযাও পর্যায়ক্রমে ফরয হয়। শুরুতে নবী ﷺ মুসলমানদেরকে মাত্র প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ রোযা ফরয ছিল না। তারপর দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসের রোযার এই বিধান কুরআনে নাযিল হয়। তবে এতে এতটুকুন সুযোগ দেয়া হয়, রোযার কষ্ট বরদাশত করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা রাখবেন না তারা প্রত্যেক রোযার বদলে একজন মিসকিনকে আহার করাবে। পরে দ্বিতীয় বিধানটি নাযিল হয়। এতে পূর্ব প্রদত্ত সাধারণ সুযোগ বাতিল করে দেয়া হয়। কিন্তু রোগী, মুসাফির, গর্ভবতী মহিলা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা এবং রোযা রাখার ক্ষমতা নেই এমন সব বৃদ্ধদের জন্য এ সুযোগটি আগের মতোই বহাল রাখা হয়। পরে ওদের অক্ষমতা দূর হয়ে গেলে রমযানের যে ক'টি রোযা তাদের বাদ গেছে সে ক'টি পূরণ করে দেয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে তখন শরীয়তের বিধি-বিধান ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হতে লাগল।

পূর্বের আয়াতগুলোতে কিসাস, অসিয়ত ইত্যাদি বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অত্র আয়াতে মু'মিনদের তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম সিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হিজরী দ্বিতীয় সনে সিয়াম (রোযা) ফরয হয়। এ সিয়াম পূর্ববর্তীদের ওপরও ফরয ছিল কিন্তু তা ছিল ভিন্নভাবে।

আয়াতের শেষাংশে সিয়াম ফরযের কারণ উল্লেখ করেছেন। তা হল তাকওয়াবান হওয়া। তাকওয়ার পরিচয় মুত্তাকীর গুণাবলী ও ফলাফল অত্র সূরার ২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইবাদতের নিয়্যতে রমযান মাসে সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন মিলন হতে বিরত থাকাকে সিয়াম বলা হয়। অবশ্য এ সংজ্ঞায় মিথ্যা, অশ্লীল ও বেহায়াপনাপূণ্য কথা-কাজ থেকে বিরত থাকাও শামিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ বর্জন করল না তার পানাহার বর্জন করায় আল্লাহ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই। (সহীহ বুখারী হা: ৫৯২৭, সহীহ মুসলিম হা: ১১৫১) অন্যত্র তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই সিয়াম নয়; বরং অসারতা ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার নামই (প্রকৃত) সিয়াম। সুতরাং যদি তোমাকে কেউ গালিগালাজ করে অথবা তোমার প্রতি মূর্খতা প্রদর্শন করে, তাহলে তুমি (তার প্রতিশোধ না নিয়ে) তাকে বল যে, আমি সিয়াম পালন করছি। (সহীহুল জামে আস সাগীর হা: ৫৩৭৬)

(أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ)

‘(সিয়াম) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য’সে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন হলো রমাযান মাস।

যারা রমযান মাসে অসুস্থ বা সফরে থাকবে তাদের জন্য ছাড় রয়েছে। অসুস্থ বা সফরে থাকার কারণে ছুটে যাওয়া সিয়ামগুলো অন্য মাসে পালন করে নেবে। আর মহিলাগণ তাদের ঋতুকালীন দিনগুলোতে সিয়াম রাখবে না, অন্য মাসে পালন করবে। তবে এক্ষেত্রে বিলম্ব না করাই উত্তম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা পালন করে নেবে।

(وَعَلَي الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ)

‘আর যারা সিয়াম রাখতে সক্ষম (কিন্তু রাখতে চায় না)’সিয়ামের তিনটি পরিবর্তন হয়েছে যেমন সালাতের তিনটি পরিবর্তন হয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮)

তার মধ্যে এটি একটি পরিবর্তন: ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুস্থ-সবল মানুষ রোযা না রাখতে চাইলে মিসকীনকে খাওয়ানোর মাধ্যমে ফিদিয়া দিয়ে দিত। অতঃপর তা ১৮৫ নং আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রত্যেক সুস্থ-সবল প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি নিজ বাড়িতে অবস্থান করে তাহলে তাকে অবশ্যই সিয়াম পালন করতে হবে।

(فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ)

“তারা মিসকিন খাওয়ানোর মাধ্যমে ফিদইয়া দেবে” অর্থাৎ অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যারা সিয়াম পালন করতে সক্ষম নয় তারা প্রত্যেক দিনের বদলে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫০৫)

খাদ্য দানের দু’টি নিয়ম: প্রথম হলো: এক দিন খাবার তৈরি করে সিয়াম সংখ্যা হিসেবে মিসকিন ডেকে খাওয়াবে। আনাস (রাঃ) বৃদ্ধ অবস্থায় এরূপ করতেন। তিনি এক অথবা দু’বছর সিয়াম রাখতে না পারায় প্রত্যেক মিসকিনকে গোশত-রুটি খাওয়াতেন। (সহীহ বুখারী হা: ৯২৮-৯২৯)

দ্বিতীয় হলো: দেশের প্রধান খাদ্য থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে প্রত্যেক মিসকিনকে সোয়া এক কেজি করে খাদ্য দান করবে। যেহেতু কাব বিন উজরার ইহরাম অবস্থায় মাথায় উকুন হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন: তোমার মাথা মুণ্ডন করে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ, কিংবা

প্রত্যেক মিসকিনকে মাথাপিছু অর্ধ সা'(প্রায় সোয়া এক কেজি) করে ছয়জন মিসকিনকে খাদ্য দান কর, কিংবা একটি ছাগল কুরবানী কর। (সহীহ বুখারী হা: ১৮১৬, সহীহ মুসলিম হা: ১২০১)

☆ সাওম-এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা শরিয়তের পরিভাষায় পানাহার এবং স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকার নাম 'সওম'। তবে সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা রোজা বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের সামান্য আগেও যদি কেউ কিছু পান করে অথবা খেয়ে ফেলে অথবা স্ত্রীসহবাস করে তাহলে রোযা হবেনা। আবার সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি রোযার নিয়ত না থাকে তাহলেও রোযা হবেনা। এই আয়াত থেকে আমরা একমাত্র জানতে পারলাম যে রোযা আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরজ ছিল। যদিও আমরা তাদেরকে হুবহু আমাদের মত রোযা রাখতে দেখিনা তবুও ইহুদী, খ্রীষ্টান এমনকি হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যেও কোন না কোন প্রকারে উপবাস তথা রোযা রাখার বিধান দেখি। মূলত রোযার বিধানও তাদের মধ্যে অন্যান্য বিধানের মত বিকৃত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে রোযা রাখা ফরজ হওয়ার ঘোষণার সাথে সাথে এর উদ্দেশ্যও বর্ণনা করা হয়েছে-তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়ার অর্থ হল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর বিধি নিষেধগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি মূহুর্তে মেনে চলা। মূলত রোযা এই মেনে চলার ধারাবাহিক ও দীর্ঘস্থায়ী ট্রেনিং দিয়ে থাকে। অন্যান্য

এবাদত করার সময় প্রায় সব সময়ই অন্য কেউনা কেউ দেখতে পায় অথবা সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু রোযার এই দীর্ঘ সময়ে যদি কেউ কিছু খেয়ে নেয় অথবা পান করে তাহলে সে করতে পারে এক্ষেত্রে অন্য কারো দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু কোন রোযাদার এটা করেনা কারণ সে মনে করে অন্য কেউ না দেখলেও আল্লাহতো দেখতে পাচ্ছেন। এই যে আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন প্রতি মূহুর্তের এই মনোভাব এবং দীর্ঘ পূর্ণ দিনের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহকে ভয় করে নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকা। - এটাই তাকওয়া এবং রোজার চেয়ে অন্য কোন মাধ্যমে এই তাকওয়া বেশী অর্জিত হতে পারেনা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. রমাযান মাসে প্রত্যেক সক্ষম মুকিম মুসলিমের জন্য সিয়াম পালন করা ফরয।

২. সিয়াম মু'মিনের তাকওয়ার বিকাশ ঘটায়।

৩. রমাযানের সিয়াম মু'মিনের সকল সগীরাহ গুনাহ মোচন করে দেয়।

৪. মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির রমযানের সিয়াম পালনে ছাড় রয়েছে। তবে অবশ্যই পরে তা আদায় করতে হবে।

৫. অনুরূপভাবে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী মা সিয়াম ছাড়তে পারবে এবং প্রতি সিয়ামের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাওয়াবে।